34630 - ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বাস্তবায়নের ফজিলত সম্পর্কে আমি প্রচুর পড়েছি, অনেকে শুনেছি। আল্লাহর উপর ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়; তা যদি একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন যাতে আমি পূর্ণ ঈমান বাস্তবায়ন করতে পারি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীবর্গের আদর্শ বিরোধী সবকিছু থেকে দূরে থাকতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অর্থ হলো- "তাঁর অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন সন্দেহ সংশয় ছাড়া এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে- তিনি একমাত্র প্রতিপালক (রব্ব), তিনি একমাত্র উপাস্য (মাবুদ) এবং তাঁর অনেকগুলো নাম ও গুণ রয়েছে।" সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে। যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয়কে বাস্তবায়ন করবে, তিনি প্রকৃত মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবেন।

প্রথমত: আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা: ইসলামী শরিয়তের অসংখ্য দলীল যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে তেমনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও সাধারণ প্রবৃত্তি দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ সাব্যস্ত করে।

১. আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে মানব ফিতরতের বা প্রবৃত্তির প্রমাণ: প্রতিটি সৃষ্টিই স্বপ্রণোদিতভাবে তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী হবে -এটাই যৌক্তিক। এ জন্য সুগভীর চিন্তা বা সুদীর্ঘ গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। সৃষ্টিমাত্রই এ স্বাভাবিক সুস্থ প্রবৃত্তির উপর টিকে থাকবে, যতক্ষণ না তার অন্তরে এমন কোন ভ্রষ্টতা প্রবেশ করে, যা তাকে এ থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রতিটি নবজাতক তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজক বানায়।"[বুখারী, ১৩৫৮ ও মুসলিম, ২৬৫৮]

২. আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির প্রমাণ: বিবেকবানমাত্রই বুঝতে পারে যে, পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত মাখলুকাত অতিবাহিত হয়েছে বা হবে এদের একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে। না থেকে কোন উপায় নেই। কেননা, কোন সৃষ্টি যেমন নিজে নিজেকে অস্তিত্ব দিতে পারে না, তেমনি দৈবক্রমে অস্তিত্বে আসাও সম্ভব নয়। সে নিজে নিজেকে অস্তিত্ব দিতে পারবে না। কারণ কোন বস্তুই আপনাকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অস্তিত্বে আসার আগে যে

নিজে অস্তিত্বহীন ছিল, সে কিভাবে স্রষ্টা হবে? অনুরূপভাবে দৈবক্রমে হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কেননা প্রতিটি ঘটনার, প্রতিটি কর্মের পেছনে একজন কর্মকার থাকে। সর্বোপরি, এমন সুকৌশল-সুশৃঙ্খল-সুনিয়ন্ত্রিত-সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পৃথিবী সৃষ্টি ও মানবজাতির আবির্ভাব এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটি হেলাফেলায় আপনাআপনি হয়নি। আপনাআপনি বিশৃঙ্খলভাবে অস্তিত্বে আসাই তো কোনো কিছুর পক্ষে সম্ভব না, আর এভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে টিকে থাকা তো বহুদূরের কথা। সুতরাং সৃষ্টি যখন নিজে নিজেকে অস্তিত্ব দানের ক্ষমতা রাখে না, আপনাআপনি হয়ে যাওয়াও যখন অবাস্তব, তখন একথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন অস্তিত্বদানকারী আছেন। আর তিনি হলেন, “আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।”

এই বুদ্ধিবৃত্তিক অকাট্য প্রমাণ বর্ণনায় আল্লাহ্ নিজে ইরশাদ করেন, “তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা?” [সূরা তুর ৫২:৩৫] অর্থাৎ তারা স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি এবং তারা নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং এ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য জুবাইর ইবনে মুতয়িম যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সূরা তূরের এ আয়াতগুলো পড়তে শুনলেন- “তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? তারা কি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী। তোমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের নিকট আছে? না কি তারা এর নিয়ন্ত্রক? “[সূরা তূর ৫২:৩৫-৩৭] তখন তিনি মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও বলে উঠলেন: “আমার হৃদয় যেন উড়ে যাবে। এ আয়াতগুলো আমার অন্তঃকরণে প্রথম ঈমানের আলো জ্বালিয়ে তুললো।”[বুখারী কয়েকটি স্থানে হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন]

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারব- “আপনার কাছে এসে কেউ একজন একটি সুরম্য অট্টালিকার গল্প করলো। যার চারদিকে পুষ্পশোভিত বাগান, পাদদেশে বইছে নয়নাভিরাম নহর, খাট-পালঙ্ক-গালিচায় সে উদ্যান সুসজ্জিত, সৌন্দর্য সেখানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর বলল, এই যে অট্টালিকা, আর তার চারপাশের যাবতীয় সাজসজ্জা সব কিন্তু নিজে নিজে হয়েছে। কেউ এগুলো তৈরী করেনি। এ কথা শুনলে আপনি নিঃসন্দেহে লোকটিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবেন এবং তার এ দাবীকে হেসে উড়িয়ে দিবেন। তাই যদি হয়, তবে কিভাবে এ কথা মেনে নেয়া সম্ভব যে - এ সুবিশাল মহাবিশ্ব, আকাশমণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকারাজি, এত নিখুঁত এত নিপুণ সবকিছু কোনো একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আপনাআপনি তৈরী হয়েছে?

এক মরুচারী বেদুঈনের মাথায়ও স্রষ্টার অস্তিত্বের এ যুক্তিনির্ভর প্রমাণটি অবলীলায় খেলে গিয়েছিলো। দ্বিধাহীন চিত্তে সে এটি প্রকাশ করেছে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, “কিভাবে তুমি তোমার রবকে চিনলে?” সে বললো, “উটের বিষ্টা দেখে আপনি বুঝে নেন যে এ পথে উট হেঁটেছে। পায়ের চিহ্ন দেখে আপনি বুঝে নেন যে, এ পথে কেউ একজন চলেছে। তাহলে স্তরে স্তরে সাজানো আকাশ, দেশে-মহাদেশে বিভক্ত জমিন, তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র...এগুলো কেন প্রমাণ করবে না যে, একজন সর্বদ্রষ্টা সর্বশ্রোতা মহান সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও প্রতিপালকত্বে বিশ্বাস স্থাপন: অর্থাৎ এ বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্

একমাত্র রব, একমাত্র প্রতিপালক। এই মহাবিশ্ব পরিচালনায় তার আর কোন অংশীদার বা সহযোগী নেই।

রব (رب) বলা হয় তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেন, পরিচালনা করেন এবং মালিকানা যার জন্য। সুতরাং – আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মালিক নেই। তিনি ছাড়া আর কোন বিশ্ব পরিচালকও নেই। পবিত্র কোরানে অনেক জায়গায় এ ঘোষণা বারবার উচ্চারিত হয়েছে - “জেনে রাখুন, সৃষ্টি করা ও হুকুমের মালিক তিনি।” [সূরা আ’রাফ ৭:৫৪] “বলুন! তিনি কে, যিনি আসমান ও জমিন হতে তোমাদেরকে রিজিক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবিতকে মৃত থেকে আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন? আর তিনি কে, যিনি সমস্ত কার্যাদি পরিচালনা করেন? অবশ্যই তারা বলবে যে তিনি একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং আপনি বলুন, তবে কেন তোমরা তাঁকে ভয় করছ না।[সূরা ইউনুছ ১০:৩১] “তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে।”[সূরা হা-মীম সেজদা, ৩২:০৫] “তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো খেজুর আঁটির উপরে পাতলা আবরণ বরাবর (অতি তুচ্ছ কিছুরও) মালিক নয়।”[সূরা ফাতির ৩৫:১৩]

একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ বলছেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ “তিনি বিচার দিবসের মালিক।” অন্য ক্বেরাতে এসেছে مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ অর্থাৎ “তিনি বিচার দিবসের রাজা বা বাদশাহ।” এই দুটি ক্বেরাতকে যদি আপনি একত্রিত করেন তাহলে চমৎকার একটি তাৎপর্য বেরিয়ে আসবে। রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝাতে “مَالِك” (অধিকর্তা) শব্দের চেয়ে “مَلِك” (রাজা) শব্দটি বেশী প্রাঞ্জল ও অর্থবোধক। কিন্তু কখনো কখনো “مَلِك” (রাজা) দ্বারা শুধু নামসর্বস্ব কর্তৃত্বহীন রাজাকেও বুঝানো হয়। অর্থাৎ সে “مَلِك” বা বাদশাহ-ই কিন্তু তার হাতে কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা না থাকায় তাকে “مَالِك” বা অধিকর্তা বলা যায় না। এজন্য দুই ক্বেরাতের “مَالِك” ও “مَلِك” শব্দদ্বয় একত্র করলে আল্লাহ্‌র জন্য রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দুটোই নির্ধারিত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র উপাস্যত্বে বিশ্বাস স্থাপন:

অর্থাৎ মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে- আল্লাহ্ই একমাত্র ইলাহ্ তথা সত্য উপাস্য। উপাসনা প্রাপ্তিতে আর কেউ তাঁর অংশীদার নয়। ইলাহ্ (إله) অর্থ হলোঃ সম্মান ও বড়ত্বের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় যার উপাসনা করা হয়। আর এটাই মূলতঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ এর তাৎপর্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই। আল্লাহ্ বলেন, “আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। সেই দয়াময় ও পরম দয়ালু ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।”[সূরা বাকারা ২:১৬৩] আরো বলেন, “আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানবানগণও এ সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি (আল্লাহ্) ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[সূরা আলে ইমরান ৩:১৮]

আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আর যা কিছুর ইবাদত করা হয়, কিংবা আল্লাহ্র সাথে আর যারই উপাসনা করা হয়...তার উপাস্যত্ব নিঃসন্দেহে বাতিল। কারণ তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা পাওয়ার অধিকার নেই। আল্লাহ্ বলেন, “আল্লাহ্, তিনিই একমাত্র সত্য। তারা তার পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা বাতিল। আর আল্লাহ্ সুউচ্চ, মহান।”[সূরা হজ্জ ২২:৬২]

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে إله তথা উপাস্য বা দেবতা নাম দিলেই সে উপাসনা পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে না। “লাত, মানাত, উজ্জা-র” প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, “এগুলোতো কতেক নামমাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেননি।”[সূরা নাজম: ২৩] ইউসুফ (আঃ) এর গল্প বলতে গিয়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, ইউসুফ কারাগারে তার দু’সঙ্গীকে বলছিলেন, “ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত বহু প্রতিপালক শ্রেয়? নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা শুধু কতকগুলো নামের ইবাদত করছো, যে সব নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছো। এইগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই।”[সূরা ইউসুফ ১২:৩৯-৪০]

সুতরাং, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। একমাত্র তাঁর জন্য ইবাদতকে একীভূত করতে হবে। কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, কিংবা প্রেরিত নবী, কিংবা অন্য কোন কিছুই এ ক্ষেত্রে তাঁর অংশীদার হতে পারে না। এজন্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল শ্লোগান ছিল একটিই। “আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই।” لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ আল্লাহ্ বলেন, “আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই, তার প্রতি ওহী ব্যতীত যে- আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।”[সূরা আম্বিয়া, ২১:২৫] আল্লাহ্ আরো বলেন, “আমি প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল পাঠিয়েছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাগুতকে বর্জন করবে।”[সূরা নাহল, ১৬:৩৬] এতকিছুর পরও মুশরিকরা কিভাবে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যান্য বাতিল উপাস্যদের উপাসনা করে?!

চতুর্থত: আল্লাহ্র সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন: অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসূলের সুন্নতে যে সমস্ত উপযুক্ত সুন্দর নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করেছেন সেগুলোকে কোন ধরনের তাহরীফ (تحريف–গুণকে বিকৃত করা), তা’তীল (تعطيل–গুণকে অস্বীকার করা), তাকয়ীফ (تكييف–গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অবয়ব নির্ধারণ করা) বা তামসীল (تمثيل–মাখলুকের গুণের সাথে সাদৃশ্য দেয়া) ছাড়া নিঃসঙ্কোচে মেনে নেয়া। আল্লাহ্ বলেন, “আর আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর ভালো নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে। অচিরেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।”[সূরা আ’রাফ, ৭:১৮০] আল্লাহ্র জন্য সুনির্দিষ্ট সুন্দর নাম সাব্যস্ত থাকার ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট দলীল। আল্লাহ্ বলেন, “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণ তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা রুম, ৩০:২৭] এ আয়াতটি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ সিফাতসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত الْمَثَلُ الأَعْلَى অর্থ হলো الوصف الأكمل তথা পরিপূর্ণ গুণ। এ আয়াতদুটো আল্লাহ্র নাম ও সিফাতের বিষয়টি আমভাবে সাব্যস্ত করে। পাশাপাশি এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা কোরানে ও

হাদিসে প্রচুর বিদ্যমান।

“আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের” অধ্যায়টি জ্ঞানের এমন একটি শাখা যে বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ চরম মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে। এ মতপার্থক্যগুলোর সূত্র ধরে তারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। এই মতভেদপূর্ণ পিচ্ছিল পটভূমিকায় আমাদের অবস্থান হলো আল্লাহ্‌র নির্দেশিত “নিরাপদ অবস্থান।” তিনি বলেন, “যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয়, তবে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে থাকো। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।”[সূরা নিসা : ৫৯] সুতরাং, আমরা এ বিষয়ে যাবতীয় মতপার্থক্যকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নতের দিকে ফিরাই। পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে আমাদের সৎকর্মশীল পূর্বসূরি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মতামতগুলো পর্যালোচনাপূর্বক গ্রহণ করি। কারণ তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের কথার তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সাহাবীদের প্রশংসা করতে গিয়ে কত সুন্দর করেই না বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন পথ অনুসরণ করতে চায়, তবে সে যেন যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের পথ অনুসরণ করে। কারণ, জীবিতরা ফেতনার আশংকা থেকে নিরাপদ নয়। আর সে সব মৃতরা হলেন রাসূলের সঙ্গী-সাথীরা। তাঁরা এ উম্মতের মাঝে হৃদয়ের দিক থেকে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও পবিত্র, জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গভীর, আর কৃত্রিম আচরণের দিক থেকে সবচেয়ে স্বল্প। তাঁরা এমন একদল লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ্‌ তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাঁর রাসূলের সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তাঁদেরকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করো। তাঁদের অনুসৃত পথ আঁকড়ে ধরো। কারণ তাঁরা ছিলেন সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

যে কেউ এ অধ্যায়ে (আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত) সাহাবী ও তাবেয়ীদের দেখানো পথ থেকে সরে গিয়েছে, সেই ভুল করেছে। পথভ্রষ্ট হয়েছে। মুমিনদের রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েছে। এবং আল্লাহ্‌র সেই ঘোষিত শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে যাতে তিনি বলেন, “হেদায়েতের পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুগামী হয়, তবে সে যাতে নিবিষ্ট আছে আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর সেটা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।”[সূরা নিসা ৪:১১৫]

আল্লাহ্‌ তায়ালা হেদায়েতের জন্য শর্ত করে দিয়েছেন যে, ঈমান হতে হবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গীদের ঈমানের মত। ইরশাদ হচ্ছে- “অনন্তর তোমরা যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তারাও যদি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করে তবে নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে।”[সূরা বাকারাহ ২:১৩৭] বুঝা গেল তাদের অনুসৃত পথ থেকে যে ব্যক্তি যত বেশী দূরে সরে যাবে, তার হেদায়েত প্রাপ্তির পরিমাণও সে হারে কমে আসবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের এ অধ্যায়ে আমাদের জন্য আবশ্যক হলো-

- আমরা আল্লাহ্‌র জন্য কেবলমাত্র সে সব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করব, যা তিনি অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাব্যস্ত করেছেন।

- এ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসসমূহকে এর প্রকাশ্য অর্থের উপরে রাখব; রূপকার্থ খুঁজতে যাবো না।
- রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীরা এগুলোর ক্ষেত্রে যে রূপ বিশ্বাস রাখতেন, আমরাও তাই রাখব। কারণ তাঁরা ছিলেন উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী।

পাশাপাশি আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে, এখানে চারটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো বিপদসংকুল খাদের মত। যে ব্যক্তি এগুলোর কোনটায় পড়বে, আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের ব্যাপারে তার ঈমান যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে না। এক্ষেত্রে ঈমানকে সঠিক মাত্রায় ধরে রাখতে হলে এ চারটি বিষয় থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। সেগুলো হল- তাহরীফ (গুণকে বিকৃত করা) , তা'তীল (গুণকে অস্বীকার করা), তামসীল (মাখলুকের গুণের সাথে সাদৃশ্য দেয়া) ও তাকয়ীফ (গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অবয়ব নির্ধারণ করা)।

(১) তাহরীফ (تحريف)

আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত সংক্রান্ত কোরান বা হাদিসের নস্‌সমূহকে (স্পষ্ট দলীলসমূহকে) এর সঠিক অর্থ থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে সরিয়ে নেয়া, কিংবা অন্য অর্থ করা, যা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল উদ্দেশ্য করেননি। যেমন- (يد الله) তথা আল্লাহ্‌র হাত। আল্লাহ্‌র হাত থাকার সিফাতটি কোরান ও হাদিসের অনেক নস্‌ দ্বারাই প্রমাণিত। এখানে "হাত" কে নেয়ামত বা কুদরত অর্থে গ্রহণ করা তাহরীফ।

(২) তা'তীল (تعطيل)

আল্লাহর সকল নাম ও সিফাতকে অস্বীকার করা কিংবা এর কোন কোনটিকে অস্বীকার করাকে "তাতীল" বলে। সুতরাং কেউ যদি কোরান ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতসমূহের কোন একটিকেও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলেই সে তার ঈমানকে যথার্থভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হলো না।

(৩) তামসীল (تمثيل)

আল্লাহ্‌র কোন সিফাত বা বিশেষণকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করাকে "তামসীল" বলে। যেমন কেউ যদি বলে- 'আল্লাহ্‌র হাত মানুষের হাতের মত বা মাখলুক যেভাবে শুনে আল্লাহ্‌ও সেভাবে শোনেন কিংবা আল্লাহ্‌ আরশের উপরে সেভাবেই বসে আছেন যেভাবে মানুষ চেয়ারে বসে...'

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করা নিঃসন্দেহে বাতিল। আল্লাহ্‌ বলছেন, "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[সূরা শুরা: ১১]

(৪) তাকয়ীফ (تكييف)

আল্লাহ্‌র সিফাত তথা বৈশিষ্ট্যসমূহের আকৃতি-প্রকৃতি ও হাকীকত নির্ধারণ করাকে “তাকয়ীফ” বলে। অর্থাৎ মানুষ তার কল্পনার দৌড় অনুযায়ী বা ভাষার চতুরতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ধরণ নির্ধারণ করা। এটা অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ ও বাতিল। মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় আল্লাহ্‌র সিফাতের বৈশিষ্ট্য জানা। আল্লাহ বলেন, “তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারবে না।”[সূরা ত্বহা: ১১০]

‘ঈমান বিল্লাহ্‌’ এর এ চারটি দিক যে ব্যক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথভাবে ঈমান এনেছে।

মহান আল্লাহ্‌ আমাদেরকে ঈমানের উপর অবিচল রাখুন। আর তিনিই সর্বজ্ঞ।

দেখুন: শায়খ উছাইমিন রচিত “শারহুল উছুলিল ঈমান”।